সুজন-এর রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কার প্রস্তাব

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২২ আগস্ট, ২০১৩)

সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা অনুযায়ী, আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই আমাদের দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার কথা। গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখার জন্য যথাসময়ে এবং সবার অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু নির্বাচন, এমনকি সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনও কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা দিতে পারে না। এছাড়াও নির্বাচনকালীন সরকার ইস্যুতে আমাদের রাজনৈতিক দলগুলোর বর্তমান অনড় অবস্থান আগামী নির্বাচনকে সম্পূর্ণরূপে অনিশ্চিত করে তুলেছে। তাই আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই আজ চরম ঝুঁকির সম্মুখীন।

এমনি প্রেক্ষাপটে আজ সর্বাধিক প্রয়োজন সংলাপ এবং জরুরি ভিত্তিতে বিরাজমান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমাদের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল - আওয়ামী লীগ ও বিএনপিই - সমস্যাগুলো সৃষ্টি করেছে এবং এগুলোর সমাধানেও এ পর্যন্ত তারা অপারগতা দেখিয়েছে। বস্তুত তাদের অনমনীয়তা এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের অনিচ্ছাই সমস্যাগুলোকে আরও জটিল করে তুলেছে। এমতাবস্থায় আমরা মনে করি যে, অনতিবিলম্বে বৃহত্তর পরিসরে সংলাপ হওয়া আবশ্যক, যে সংলাপে অংশ নেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম, ব্যবসায়ী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা।

সংলাপের আশু উদ্দেশ্য হবে যথাসময়ে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠান। এর দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হবে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সত্যিকারার্থে কার্যকর ও শক্ত ভিতের ওপর দাঁড় করানো, যাতে এটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিতে পারে এবং দেশে সুশাসন কায়েম হয়। আর এর জন্য প্রয়োজন হবে কতগুলো সুদূরপ্রসারী পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার। আমরা আশা করি যে, বৃহত্তর পরিসরের এ সংলাপের মাধ্যমে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে একটি ঐক্যমত্য সৃষ্টি হবে, যার ভিত্তিতে স্বাক্ষরিত হবে একটি 'জাতীয় সনদ'।

প্রসঙ্গত, বহুদিন থেকেই 'সুজন' বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনকে কলুষমুক্ত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। এ লক্ষ্যে ২০০৪ সালে প্রথম *দৈনিক প্রথম আলো* ও *দি ডেইলি স্টারের* সহায়তায় আমরা এক গোলটেবিল বৈঠকের মাধ্যমে একটি সুদূর প্রসারী সংস্কার প্যাকেজ উত্থাপন করি। এরপর ২০০৫ সালে ১৫ জুলাই তৎকালীন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা একটি সংবাদ সম্মেলনে ১১ দলের পক্ষে 'তত্ত্বাবধায়ক সরকার, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের রূপরেখা' শিরোনামে কতগুলো সুপারিশ তুলে ধরেন, যাতে আমাদের অধিকাংশ সংস্কার ধারণা স্থান পায়। পরবর্তীতে ২০০৫ সালের নভেম্বর মাসে পল্টন ময়দানের মহাজোটের জনসমাবেশে প্রায় একই ধরনের প্রস্তাব (২৩ দফা) উত্থাপন করা হয়। এদিকে *গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ* (আরপিও) সংশোধনের লক্ষ্যে সুজনের পক্ষ থেকে আমরা নির্বাচন কমিশনে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব অন্তর্ভূক্ত করে আরপিওর একটি খসড়া প্রেরণ করি। সিপিডিসহ আরও অনেকেই এ ধরণের প্রস্তাব নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করে। কমিশনের প্রস্তুত করা আরপিও চূড়ান্ত সংশোধনীতে আমাদের প্রায় সব প্রস্তাবই অন্তর্ভূক্ত হয়।

আজকের গোলটেবিলের উদ্দেশ্য হলো, জাতীয় ঐক্যমত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি সংস্কার প্যাকেজ নিয়ে আলোচনা। সংস্কার ধারণাগুলোকে তিনভাবে বিভক্ত করা হয়েছে: নির্বাচনপূর্ব সংস্কার, নির্বাচনকালীন সংস্কার ও নির্বাচনপরবর্তী সংস্কার।

নির্বাচনপূর্ব সংস্কার

(১) গণতান্ত্রিক রীতিনীতির চর্চা

- রাজনৈতিক দলগুলোর শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান করবে এবং জাতীয় স্বার্থে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করা।
- যে কোন সংকট নিরসনে এবং জাতীয় ইস্যুতে রাজনৈতিক দলসমূহের সংসদ ও সংসদের বাইরে নিয়মিত মতবিনিময় করা।
- রাজনৈতিক দলগুলোর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে সর্বসম্মতভাবে একটি আচরণবিধি প্রণয়ন এবং একটি কার্যকর 'ওয়ার্কিং রিলেশনশিপ' গড়ার লক্ষ্যে এটি যথাযথভাবে অনুসরণ করা।

(২) নির্বাচনকালীন সরকার

- সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা।
- নির্বাচনকালীন সময়ে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনের সুপারিশ মত সরকারি কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের তাৎক্ষণিক বদলি ও প্রয়োজনে শাস্তি নিশ্চিত করা।
- নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন, শক্তিশালীকরণ ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিতকরণ।

(৩) ভোটার তালিকার নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিতকরণ ও বিধি মোতাবেক হালনাগাদকরণ

- তৃতীয় পক্ষ দ্বারা বিদ্যমান ভোটার তালিকার সঠিকতা যাচাই করা।
- সম্ভব হলে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে ভোটার তালিকা আরেকবার হালনাগাদ করা।

(৪) সীমানা পুনঃনির্ধারণের যথার্থতা নিশ্চিতকরণ

- সীমানা পুনঃনির্ধারণ অধ্যাদেশ সংশোধন করে ভারতের ন্যায় একটি স্বাধীন 'সীমানা নির্ধারণ কর্তৃপক্ষ' সৃষ্টি করা।
- নবগঠিত সীমানা পুনঃনির্ধারণ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্ভব হলে দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সংসদীয় আসনসমূহের সীমানা পুনঃনির্ধারণ করা।

(৫) নির্বাচনী সংস্কার

- প্রতিরক্ষা বিভাগকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা।

- দলের তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মতামতের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ তিন সদস্য বিশিষ্ট প্যানেল গঠন এবং উক্ত প্যানেল থেকে সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদানের বিধান পুনঃপ্রবর্তন করা।
- নির্বাচনী ব্যয় হ্রাসের লক্ষ্যে আইনী বিধান করা (যেমন, হলফনামায় প্রদত্ত প্রার্থীদের তথ্যের ভিত্তিতে রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক পোস্টার প্রকাশ ও পরিচিতি সভা/প্রজেকশন মিটিংয়ের আয়োজন করা)।
- সংসদে ভেঙ্গে যাওয়ার ছয় মাস পূর্বে নির্বাচন সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম, অনুষ্ঠান ও প্রচার প্রচারণার খরচ প্রার্থী/দলের নির্বাচনী ব্যয়ে অন্তর্ভূক্ত করা।
- সংসদ ভেঙ্গে যাওয়ার ছয় মাস পূর্ব উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন বন্ধ করা।
- নির্বাচন কমিশন কর্তৃক 'মনিটর' নিয়োগ করে প্রতি আসনে প্রতিদিন নির্বাচনী ব্যয় মনিটরিং বা তদারকি করা।
- রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক উৎসের বিস্তারিত বিবরণী প্রকাশ করা।
- প্রার্থী ও রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী ব্যয়ের বিবরণী কঠোরভাবে নিরীক্ষা করে তথ্য গোপন ও অসত্য তথ্য প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষেত্রমত নির্বাচন বাতিলের বিধান করা।
- নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণায় কারসাজি ও বিলম্ব রোধে 'রেজাল্ট শিটে'র স্ক্যান কপি কেন্দ্র থেকে কমিশনে ইলেকট্রনিক্যালি সরাসরি প্রেরণ এবং তাৎক্ষনিকভাবে (real-time) তা কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা করা।
- 'না'-ভোটের বিধান পুনঃপ্রবর্তন করা এবং 'না' ভোট জয়ী হলে নতুন প্রার্থীর অংশগ্রহণে পুনঃনির্বাচনের আয়োজন করা।
- হলফনামার ছকে পরিবর্তন আনা [যেমন, বয়স, পেশার সুস্পষ্ট বিবরণ, আয়ের উৎসের বিস্তারিত তথ্য, নিজের ও নির্ভরশীলদের সম্পদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা ও মূল্য উল্লেখ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিকানার ও সরকারের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্কের বিস্তারিত তথ্য, প্রার্থীর রাজনৈতিক পরিচিতি (দলবদলের তথ্যসহ অতীতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিবরণী) ইত্যাদি সংযোজন করা।]
- হলফনামা কঠোরভাবে যাচাই-বাছাই পূর্বক অসত্য তথ্য প্রদান ও তথ্য গোপনের অভিযোগে কমিশনকে নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা প্রদান করা।
- গুরুতর অনিয়ম ও অসদাচারণের অভিযোগে নির্বাচনী ফলাফল স্থগিত ও নির্বাচন বাতিলের ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে প্রদান করা।
- বিরুদ্ধ হলফনামা (counter affidavit) প্রদানের বিধান (প্রজ্ঞাপনের পরিবর্তে) আইনে অন্তর্ভুক্ত করা।
- নির্বাচনী বিরোধ ছয় মাসের মধ্যে নিস্পত্তিকরণের লক্ষ্যে হাইকোর্টের প্রয়োজনীয় বেঞ্চ গঠন করা।
- ব্যালটে মার্কার পাশাপাশি ছবি রাখার বিধান প্রবর্তন করা।
- সংরক্ষিত আসন সংক্রান্ত আইনের সংশোধন করে হলফনামা ও আয়কর বিবরণী মনোনয়নপত্রের সঙ্গে দাখিল বাধ্যতামূলক করা।

(৬) **ভোট গ্রহণ ও গণনায় প্রযুক্তির ব্যবহার**

- মনোনয়নপত্র ইলেকট্রনিক ফাইলিংয়ের বিধান করা।
- ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন ব্যবহারের ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যমত্য সৃষ্টির মাধ্যমে তা পর্যায়ক্রমে পুনঃপ্রবর্তন করা।

(৭) **নির্বাচন কমিশনের সংস্কার**

- সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদের নির্দেশনার আলোকে নির্বাচন কমিশন সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন করা।
- আইনের আলোকে একটি নিরপেক্ষ অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা।
- কমিশন সচিবালয়ের কর্মকর্তাদের জন্য 'নির্বাচন ক্যাডার' সার্ভিসের প্রবর্তন করে যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বনে ভবিষ্যতে নিয়োগ প্রদান করা।
- গত এবং বর্তমান সরকারের আমলে কমিশন সচিবালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের যোগ্যতা বিবেচনায় ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় (Due diligence) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষণ ও অন্য প্রতিষ্ঠানে সম্ভাব্য আত্মীকরণের লক্ষ্যে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন করা।
- নির্বাচন পরবর্তীকালে কমিশনকে হলফনামা ও নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য খতিয়ে দেখার ক্ষমতা প্রদান করা।

নির্বাচনকালীন সংস্কার

(১) তিনদলীয় জোটের রূপরেখায় অন্তর্ভুক্ত 'আচরণবিধি'র আদলে একটি কঠোর নির্বাচনী আচরণবিধি প্রণয়ন করে তা কার্যকর করা। তিন জোটের রূপরেখায় অন্তর্ভূক্ত আচরণবিধির অঙ্গীকার ছিলো: শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো, সংঘাত পরিহার করা, পারস্পরিক কুৎসা রটনা থেকে বিরত থাকা, সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় না দেওয়া, প্রশাসনকে প্রভাবিত না করা, সরকারি প্রচার মাধ্যমের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা, সব বিরোধ তাৎক্ষণিকভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে নিরসন করা, নির্বাচনের দিনে সব কারচুপি ও দুর্নীতির অবসান করা, নির্বাচনী ব্যয়সীমা মেনে চলা, নির্বাচনের মাধ্যমে প্রদত্ত গণরায় মেনে নেওয়া ইত্যাদি।

(২) সন্ত্রাসী, দুর্নীতিবাজ, কালোটাকার মালিক, সাজাপ্রাপ্ত আসামী ও অন্যান্য অবাঞ্চিত ব্যক্তিদের সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার ব্যাপারে রাজনৈতিক দলের মধ্যে ঐক্যমত্য সৃষ্টি ও তা কার্যকর করা।

(৩) ভোটারদের তথ্যভিত্তিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে হলফনামা ও আয়কর বিবরণীতে প্রদত্ত তথ্য সন্নিবেশিত করে প্রার্থীদের তুলনামূলক প্রোফাইল তৈরি করে তা ভোটারদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করা।

(৪) প্রতিটি আসনে প্রজেকশন মিটিং এর ব্যবস্থা করা।

(৫) প্রার্থীদের প্রোফাইল, দলের নির্বাচনী ইশতেহার ও সীমিত সংখ্যক প্রজেকশন মিটিংয়ের ধারা বিবরণী সরকারি (বিটিভি, বেতার ও সংসদ টিভির) গণমাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা করা।

নির্বাচন-পরবর্তী সংস্কার

(১) প্রাতিষ্ঠানিক (সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের) সংস্কার

১.১ বিচার বিভাগের সংস্কার

- যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে উচ্চ আদালতে নিয়োগ এবং আদালতের জন্যে পৃথক সচিবালয় স্থাপনের লক্ষ্যে আইনী বিধান পুনঃপ্রবর্তন করা।
- গত এবং বর্তমান সরকারের আমলে উচ্চ আদালতে নিয়োগপ্রাপ্ত বিচারকদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিবেচনায় এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় (Due diligence) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষণের লক্ষ্যে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি/সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল গঠন করা এবং অযোগ্যদের তালিকা অভিশংসনের লক্ষ্যে সংসদে প্রেরণ করা।
- *মাজদার হোসেন* মামলার রায়ের আলোকে মন্ত্রণালয়ের কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই বিচার বিভাগের কর্তৃত্বাধীনে নিম্ন আদালতসমূহে নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি নিশ্চিত করা।
- বিচারকদের জন্য একটি আলাদা বেতন কাঠামো কার্যকর করা।
- সুপ্রিম কোর্টে মামলার জট লাঘবের লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে একটি আপিল অথরিটি স্থাপন করা।
- উপজেলা পর্যায়ে বিচারিক আদালত স্থাপন করা।

১.২ সরকারি কর্মকমিশন ও প্রশাসনিক সংস্কার

- সাংবিধানিক নির্দেশনার আলোকে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের চাকুরীর শর্তাবলী নিরূপণের লক্ষ্যে আইন প্রণয়ন করা।
- সরকারি কর্মকমিশনকে পুনর্গঠন করা।
- প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে সব সদস্য দুর্নীতি ও অসদাচরণমূলক কার্যক্রমে জড়িত ছিলেন বা আছেন তাদের কার্যক্রম খতিয়ে দেখার জন্য একটি নিরপেক্ষ কমিটি গঠন করে অভিযুক্তদেরকে বিচারের আওতায় আনার ব্যবস্থা করা।
- পুলিশ, ভূমি প্রশাসন ও জনপ্রশাসন ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের মাধ্যমে জনদুর্ভোগ লাঘব ও জনগণের প্রাপ্য সেবা স্বল্পব্যয়ে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রশাসনিক ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ, পদোন্নতি, পুরস্কার ও শাস্তির বিধানাবলীতে যথাযথ পরিবর্তন এনে এসব ক্ষেত্রে মেধা, যোগ্যতা, পেশাদারিত্ব ও দক্ষতাকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা।
- প্রশাসন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দলীয়করণের অবসান করে পেশাদারিত্ব বিকাশের ওপর জোর প্রদান করা।
- সকল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের তথ্য-প্রযুক্তিসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ (প্রশিক্ষণের খাতিরে প্রশিক্ষণ নয়) আয়োজনের মাধ্যমে সরকারি ব্যবস্থাপনায় তথ্য-প্রযুক্তি প্রয়োগ করা।
- প্রশাসনিক সংস্কারের অংশ হিসেবে 'গোল্ডেন হেন্ডশেকে'র মাধ্যমে অপ্রয়োজনীয় লোকবল হ্রাস করে তা যৌক্তিক পর্যায়ে আনা এবং ভবিষ্যত নিয়োগের ক্ষেত্রে তথ্য-প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন তরুণদের নিয়োগ প্রদান করা।

১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশন

- দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনে আইনের সংস্কার এবং প্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ নিশ্চিত করা।
- দুর্নীতি দমন কমিশনকে পুনর্গঠন করা।
- দ্রুততম সময়ের মধ্যে ন্যায়পাল নিয়োগের ব্যবস্থা করা।
- হাই প্রোফাইল (শেয়ার মার্কেট, পদ্মাসেতু, হলমার্ক, বেসিক ব্যাংক, ডেসটিনি ইত্যাদি) দুর্নীতিসহ সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি কার্যকর ও সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনার অংশ হিসেবে এক বা একাধিক নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি ও দ্রুত বিচার সম্পন্নের লক্ষ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা।
- অবৈধ ভিওআইপি ব্যবসায় নিয়োজিত দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির এবং ভবিষ্যতে এ ব্যবসা উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা।

১.৪ তথ্য কমিশন ও তথ্য প্রকাশ

- তথ্য কমিশন পুনর্গঠন করা।
- তথ্য অধিকার আইনকে কার্যকর করার লক্ষ্যে সারাদেশে গণসচেনতা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি আন্দোলন গড়ে তোলা।
- জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করে না এমন সব সরকারি তথ্য স্ব-প্রণোদিত হয়ে প্রকাশের ব্যবস্থা করা।

১.৫ মানবাধিকার কমিশন

- মানবাধিকার কমিশন পুনর্গঠন করা।
- কমিশনকে কার্যকর করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান করা।

১.৬ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন

- বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে পুনর্গঠন করা।
- ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ সংশোধন করে এগুলোকে যুগোপযোগী করার মাধ্যমে লেজুড়বৃত্তির শিক্ষক রাজনীতির অবসান এবং উচ্চ শিক্ষার মানোন্নয়নে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নিরপেক্ষ ও যথাযথ বাছাই কমিটির মাধ্যমে যোগ্য, দক্ষ ও নির্দলীয় ব্যক্তিদেরকে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা।
- গত দুই সরকারের আমলে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বিবেচনায় এবং যথাযথ প্রক্রিয়ায় (Due diligence) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে কিনা তা নিরীক্ষণ ও অযোগ্যদের বাদ দেওয়ার লক্ষ্যে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে এগুলোকে একটি নীতি কাঠামোর মধ্যে আনার এবং 'এক্রেডিটেশনের' ব্যবস্থা করা।
- ঢালাওভাবে উচ্চ শিক্ষার পরিবর্তে কারিগরি শিক্ষাকে উৎসাহিত লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা।

(২) **জাতীয় সংসদকে প্রতিনিধিত্বশীল ও কার্যকরকরণ**

- সংসদীয় কমিটিগুলো সংসদের প্রথম অধিবেশনে গঠন করা এবং বিরোধী দল থেকে পাবলিক একাউন্টস, পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক কমিটির প্রধান করা।
- সংসদীয় কমিটিকে কার্যকর করার মাধ্যমে সরকারের স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার নিয়োগ করা।
- স্পীকারের অনুমতি ছাড়া একটানা ৩০ দিনের বেশি অনুপস্থিতির, বিশেষ কারণ ব্যতীত সদস্যপদ বাতিলের বিধান প্রবর্তন করা।
- সংসদ ও সংসদ সদস্যদের বিশেষ অধিকার সম্পর্কিত আইন প্রণয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সংসদীয় কমিটিকে কার্যকর করার মাধ্যমে সংসদ সদস্যদের সর্বক্ষেত্রে সদাচারণ নিশ্চিত করা।
- সংসদ সদস্যদের জন্য প্রস্তাবিত আচরণবিধি আইন প্রণয়ন এবং প্রতি বছর তাদের ও নির্ভরশীলদের সম্পদের হিসাব প্রকাশের ব্যবস্থা করা।
- সংসদ সদস্যদের শুল্কমুক্ত গাড়ী আমদানী ও অন্যান্যর বৈষম্যমূলক সুযোগ-সুবিধা প্রদানের বিধান বিলুপ্ত করা।
- সংসদে নারীদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ এবং সেসব আসনে ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।
- জাতীয় সংসদে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৩) **বিকেন্দ্রিকরণ ও স্থানীয় সরকার**

- দায়দায়িত্ব ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে একটি বলিষ্ঠ বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ এবং সেই নীতির অধীনে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশাসনিক ও আর্থিক ব্যবস্থার পুর্নবিন্যাস করা।
- স্থানীয় সরকার বিদ্যমান আইনগুলোর সংস্কারের মাধ্যমে শক্তিশালী ও স্বায়ত্তশাসিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- যথাসময়ে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠান বাধ্যতামূলক এবং নির্বাচন কমিশনকে এসব নির্বাচন অনুষ্ঠানের ক্ষমতা প্রদান করা। (সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদ সংশোধন করতে হবে)
- স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদের রাজনৈতিক প্রতিহিংসা থেকে সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে সরকারের নির্বাহী বিভাগ কর্তৃক জনপ্রতিনিধিদের বরখাস্তের বিধান বাতিল করা।
- অর্থবন্টন নীতিমালা (যেমন, জাতীয় বাজেটের অর্ধেক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যয় করা) ও অব্যাহতভাবে আইন-কানুন পর্যালোচনা ও পরিবর্তনের সুপারিশ এবং আধা-বিচারিক ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের শৃঙ্খলা ভঙ্গের প্রবিধান প্রনয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার কমিশন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
- স্থানীয় সরকার ক্যাডার সার্ভিস প্রবর্তন করা।
- আদালতের নির্দেশনার (*আনোয়ার হোসেন মঞ্জু বনাম বাংলাদেশ*) আলোকে সংসদ সদস্যদেরকে স্থানীয় উন্নয়ন কার্যক্রমে জড়িত হওয়া থেকে বিরত রাখা এবং তাঁদের ১৫ কোটি টাকার প্রকল্প সুপারিশের সিদ্ধান্ত বাতিল করা।
- বার্ড, আরডিএ ও এনআইএলজির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি এবং ওগুলোকে সত্যিকারার্থে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা।

(৪) **সংবিধান সংশোধন**

- রাষ্ট্রপতি পদের ন্যায় প্রধানমন্ত্রী পদে কোনো ব্যক্তির নির্বাচন সর্বোচ্চ দুই মেয়াদে সীমিত করা।
- সংবিধানে রাজনৈতিক দল সম্পর্কিত নতুন ধারা সংযোজন এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ রোধে একই ব্যক্তির দল ও সরকার প্রধান না হওয়ার বিধান করা।
- আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বসহ মিশ্রব্যবস্থা (অঞ্চলভিত্তিক আসনবিন্যাস ও আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে) প্রবর্তন করা।
- সংসদের মেয়াদ চার বছরে কমিয়ে আনা এবং স্টাগার্ট পদ্ধতির (যেমন, প্রতি বছর এক-চতুর্থাংশ সংসদ সদস্যদের নির্বাচন অনুষ্ঠান) প্রর্বতন করা।
- সংসদ সদস্যদের রিকলের বিধান প্রবর্তন করা।
- সংসদ নির্বাচনে একটির বেশি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করতে পারার বিধান করা।

- নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারি অপরাধে সাজাপ্রাপ্তদের সাজাপ্রাপ্তির দিন থেকেই সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হবার অযোগ্য ঘোষণা করা। একইসাথে সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় এ সকল অপরাধে দোষী সাংসদদের সদস্যপদ বাতিলের বিধান করা।
- দুইকক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করা।
- রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতায় ভারসাম্য আনয়ন করা।
- সংসদ সদস্য ছাড়াও স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিধান প্রবর্তন করা।
- জাতীয় সংসদ কর্তৃক উচ্চ আদালতের বিচারকদের এবং অন্যান্য সাংবিধানিক ও বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে নিয়োগপ্রাপ্তদের অভিশংসনের ক্ষমতার প্রবর্তন/পুনঃপ্রবর্তন করা।
- ৭০ অনুচ্ছেদের সংস্কার করা (জাতীয় বাজেট পাশ এবং সরকারের পতন হয় এমন বিষয় ছাড়া সকল ক্ষেত্রে সংসদ সদস্যদের দলীয় সিদ্ধান্তের বাইরেও স্বাধীনভাবে মতমত বা ভোট প্রদানের ক্ষমতা প্রদান করা)।
- আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা।
- উপরিউক্ত ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সংবিধানে (যেমন, পঞ্চদশ সংশোধনী) পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে রাজনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সর্বদলীয় সাংবিধানিক পর্যালোচনা কমিটি গঠন করা।

(৫) আইনের শাসন ও মানবাধিকার সংরক্ষণ

- যুদ্ধাপরাধের বিচার অব্যাহত রাখার এবং সাজাপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধিদের ক্ষমা না করার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার প্রদান করা।
- ধর্মীয় উগ্রবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদানের পরিবর্তে তা কঠোর হস্তে দমন এবং উগ্রবাদি সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ করা।
- গত ও বর্তমান সরকারের আমলে প্রত্যাহার করা সব 'রাজনৈতিক হয়রানিমূলক' মামলা পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে একটি নিরপেক্ষ কমিটি গঠন এবং অন্যায্যভাবে প্রত্যাহারকৃত মামলাগুলোর বিচারিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করা।
- ভবিষ্যতে 'রাজনৈতিকভাবে হয়রানির' অজুহাতে মামলা প্রত্যাহার বন্ধ করা।
- স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনী বিধান সৃষ্টি করা এবং বিচারক ও বেঞ্চের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- বিদ্যমান সব আইনের পর্যালোচনা করে সেগুলোকে বাতিল অথবা যুগোপযোগী করা।
- গুম, বিচার বহির্ভূত হত্যা ও রিমান্ডের নামে নির্যাতন রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- পুলিশের একই ব্যক্তিকে তদন্ত ও প্রসিকিউশনের দায়িত্ব প্রদান থেকে বিরত রাখা।
- সকল প্রকার নাগরিক ও মানবাধিকার সংগঠনের স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করা।

(৬) গণমাধ্যমের স্বাধীনতা

- সকল প্রকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।
- তথ্য প্রচার অবাধ করার লক্ষ্যে বিটিভি ও বাংলাদেশ বেতারসহ সকল সরকারি গণমাধ্যমের স্বায়ত্বশাসন ও পেশাদারিত্ব নিশ্চিত করা।

(৭) রাজনৈতিক দলের সংস্কার

- রাজনৈতিক দলের গঠনতন্ত্রে সকল স্তরের কমিটি নির্বাচন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি এবং তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা।
- ছায়া মন্ত্রীসভা গঠন করা।
- দলের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ করার লক্ষ্যে আয়-ব্যয় ও নির্বাচনী ব্যয়ের তথ্য প্রকাশ করা।
- দলের কমিটিগুলোর এবং প্রাথমিক সদস্যদের নাম ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা।
- রাজনৈতিক দলের ছাত্র, শিক্ষক ও শ্রমিকদের নিয়ে লেজুড়বৃত্তির অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন এবং বিদেশি শাখা বিলুপ্ত করার বিধান কঠোরভাবে প্রয়োগ করা।

(৮) অর্থনৈতিক সংস্কার ও দারিদ্র্য দূরীকরণ

- যুগোপযোগী অবকাঠামো সৃষ্টি এবং বিদ্যুৎ ও জ্বালানী সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ করা।
- পুঁজি পাচার রোধে ও শিল্প বিনিয়োগ উৎসাহের লক্ষ্যে যথাযথ উৎসাহ কাঠামো প্রণয়ন এবং বিনিয়োগের ক্ষেত্রে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- একবিংশ শতাব্দী ও বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলার লক্ষ্যে দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কারিগরি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার প্রদান এবং দক্ষ জনশক্তি রপ্তানী উৎসাহিত করা।
- তৈরি পোশাক শিল্প, জনশক্তি রপ্তানী, ব্যাংক, বিমাসহ সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শেয়ার মার্কেট ইত্যাদিসহ সকল ধরণের শিল্প, ব্যবসা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধে সংগঠিত দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে তাদের সঞ্চয়ের সমপরিমাণ সম্পদ সরাসরি প্রদান এবং সকল সরকারি সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বঞ্চনা ও হয়রানির অবসান করা।
- কর কাঠামোর সংস্কার করা।
- দরিদ্রদের সন্তানদের জন্যে মানসম্মত শিক্ষা ও তাদের নিজেদের জন্য যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা।

- শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে জাতীয় ন্যূনতম মজুরী কাঠামো ঘোষণা করা ।
- দরিদ্রদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ‘খাদ্য নিরাপত্তা আইন’ প্রণয়ন করা।

পরিশেষে, আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংবিধান থেকে ‘এক চুল না নড়ার’ সাম্প্রতিক বক্তব্য এবং এর প্রতিক্রিয়ায় প্রধান বিরোধী দলের পক্ষ থেকে আবারও নির্বাচন বর্জনের ঘোষণায় সবার অংশগ্রহণে দশম জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিষয়ে সংশয় আরও ঘনীভূত হয়েছে। এমনকি অনেকে মনে করেন যে, এর মাধ্যমে সংঘাতের সম্ভাবনা অনিবার্য হয়ে পড়েছে এবং যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ মূলত রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এমতাবস্থায় আজ সম্ভবত বলার সময় এসেছে – শুধমাত্র নির্বাচন নয়, চাই স্থায়ী সমাধান। সময় এসেছে আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পথের বাধাগুলো দূর করার লক্ষ্যে উচ্চকণ্ঠ হবার। সুজনের পক্ষ থেকে সেই আহ্বানই রইল আজ সবার কাছে।